নেপথ্যের শরীরঃ এক্সট্রা, ভিএফএক্স, এবং ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিবর্তন

কার্তিক নায়ার

২৮ অক্টোবর, ২০২৪

ভিজ্যুয়াল এফেক্ট (ভিএফএক্স) প্রযুক্তিতে অগ্রগতির ফলে ভারতের ব্লকবাস্টার ছবিগুলিতে অসাধারণ কিছু দৃশ্যের নির্মাণ হচ্ছে। *পন্নিয়িন সেলভান* (মণি রত্নম, ২০২২) ছবিটিতে একটি দশম শতাব্দীর সাম্রাজ্য জীবন্ত হয়ে ওঠে। *আদিপুরুষ* (ওম রাউত, ২০২৩) ছবিতে আমরা পৌরাণিক লঙ্কাদহনের দৃশ্য দেখতে পাই। *পাঠান* (সিদ্ধার্থ আনন্দ, ২০২৩) ছবিতে শাহ রুখ খানকে উড়তে উড়তে গভীর গিরিখাতের ভিতর ঢুকতে ও বেরতে দেখা যায়। এই দৃশ্যগুলি সম্পূর্ণ কম্পিউটারে তৈরি বা কম্পিউটার-জেনারেটেড-ইমেজারি (সিজিআই)-এর সঙ্গে লাইভ-অ্যাকশান ফোটোগ্রাফির একটি শৈল্পিক মিশ্রণ। একটি চলচ্চিত্র তৈরির "পোস্ট-প্রোডাকশন" স্তরে সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশনের সাহায্যে ভিএফএক্স শিল্পীরা অনেক সময়ই ছবির শ্যুটিং-এর আদত জায়গা ও তারকাদের থেকে সময় ও পরিসরের প্রেক্ষিতে অনেক দূরে, স্টুডিওতে বসে এই দৃশ্যগুলি তৈরি করেন। কিন্তু, এই মুহূর্তে চলচ্চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ঠিক কতটা কেন্দ্রীয় ভূমিকা নিয়েছে, তা ব্যাখ্যা করার জন্য শুধু "পোস্ট-প্রোডাকশন" শব্দটি যথেষ্ট নয়। এখন, ছবি তৈরির শুরুতেই, কোরিওগ্রাফার বা প্রোডাকশন ডিজাইনারের মতই, ভিএফএক্স অধীক্ষকও ছবির চেহারা ও কাহিনীর বিষয়ের আলোচনায় অংশ নিয়ে থাকেন। ভিএফক্স এফেক্ট, যা চলচ্চিত্র নির্মাণের বাস্তব প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রতিদিন কিছু না কিছু বদল আনছে, তার গুণমানের উপর ভিত্তি করেই আজকাল একটি ছবির পরিকল্পনা, তার স্ক্রিপ্ট তৈরি ও শ্যুটিং হয় এবং ও বিক্রি হয়।

তবে, আকর্ষনীয় দৃশ্যের নির্মাণ আর স্পেশাল এফেক্টের উপরে আমরা বেশি মনোযোগ দিলেও, এই বদলটি আসলে তার থেকেও অনেক বেশি কিছু। একটি ছবির প্রায় প্রতিটি ফ্রেমেই ভিএফএক্স শিল্পীরা তাঁদের ছাপ রেখে যান – ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য আলোর রঙ নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে, সেন্সর বোর্ডের দাবিতে কোনও বিশেষ দৃশ্যের সংশোধন করার মত সব কাজই তাঁরা করেন। তাঁদের এই কাজগুলি যে সব সময় খুব জমকাল বা অবধারিতভাবে

দৃষ্টি-আকর্ষক, তা একেবারেই নয়। সাম্প্রতিক কালের গভীরতর অগ্রগতির আরেকটি চিহ্ন হল, কায়িক কুশলীদের নিঃশব্দে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ও তাঁদের জায়গায় ফ্রেম জুড়ে ভার্চুয়ালভাবে নির্মিত কুশলীদের উপস্থিতি। সমালোচক, সাংবাদিক ও ভারতীয় সিনেমার বিষয়ে পণ্ডিতদের এই বিষয়টির উপর আরও মনোযোগ দেওয়া উচিত। আমার মতে, জীবন্ত মানুষের বদলে ভার্চুয়াল চরিত্রের ব্যবহার, শিল্প হিসেবে চলচ্চিত্রের সারমর্মের ক্ষেত্রে শুধু নয়, সিনেমাটিক প্রতিনিধিত্বের ভিজ্যুয়াল রাজনীতি এবং সিনেমাটিক প্রোডাকশনের রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রেক্ষিতেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন তুলে ধরে।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের ব্লকবাস্টার যন্ত্রের ঠিক কেন্দ্রে থাকেন সুপারস্টাররা, কিন্তু বৃহত্তর প্রেক্ষিতে, চলচ্চিত্রের প্রয়োজন এমন অসংখ্য মানুষের যাঁরা সবার অলক্ষ্যে নেপথ্যে থেকে যান এবং যাঁরা আছেন বলেই তারকারা স্ক্রিনে উদ্ভাসিত হতে পারেন। *পদ্মাবত* (সঞ্জয় লীলা বনশালী, ২০১৮) ছবির একটি দৃশ্যে দেখা যায় যে বহিরাগতদের দ্বারা আক্রান্ত মধ্যযুগের রাজস্থানের একটি দুর্গে, আত্মাহুতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে, শত শত মহিলা সিঁড়ি বেয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সাজান চিতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের রানি (দীপিকা পাড়ুকোন)-কে অনুসরণ করে সারি দিয়ে চলা এই মহিলাদের সমষ্টি গণ-আত্মহত্যার একটি আবেগপূর্ণ দৃশ্য উপস্থিত করেন। ছবির এই বিশেষ দৃশ্যটির এমনই একটি অসাধারণ প্রভাব ছিল যে, ছবিটি বেরনোর পর তা একটি উত্তপ্ত বিতর্কের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু, এই দৃশ্যটি তৈরি করার সময়টিও কম উত্তপ্ত ছিল না। তীব্র গরমে মুম্বাই-এর ফিল্ম সিটিতে বেশ কিছুদিন ধরে এই দৃশ্যটি তোলা হয়। আগুন আর ধোঁয়া তৈরি জন্য বাস্তব ও ভার্চুয়াল – দুই উপাদানই ব্যবহৃত হয়েছিল। জ্বলন্ত চিতাটি ডিজিটাল উপায়ে তৈরি করা হলেও, ফ্রেমে ছড়িয়ে থাকা ছোট আকারের আগুনের জন্য রবারের টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সাবধানে আড়াল করে রাখা ওই জ্বলন্ত টায়ার থেকে বেরনো কালো ধোঁয়া ফ্রেম ভরে দিয়েছিল। কিন্তু অনুসরণকারী মহিলাদের একসঙ্গে জড় করাই একটা বিশাল সমস্যা বলে প্রমাণিত হয়। জানা গেছে, ছবির পরিচালক সঞ্জয় লীলা বনশালী ৩৫০ জন এক্সট্রা বা "জুনিয়র আর্টিস্ট"-দের নিয়ে অভিযোগও করেছিলেন। "এই দৃশ্যটির শ্যুটিং-এর জন্য পুরো এক সপ্তাহ লেগেছিল বলে জুনিয়র আর্টিস্টরা অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন। তাঁরা কয়েকজন মিলে দল করে শটের মাঝখানে বেরিয়ে যেতেন বা ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়তেন।" এই আর্টিস্টদের ক্লান্তির কারণ হতে পারে মুম্বাই-এর গরমকালের নির্দয় তাপমাত্রা এবং ছবির নির্মাতার কুখ্যাত অতিরিক্ত যথার্থতা ও, বিশেষত, পোড়া রবারের টায়ারের

ক্ষতিকর প্রভাব। স্থিরচিত্রে কালো ধোঁয়া দেখতে হয়ত অতি চমৎকার, কিন্তু ওই ধোঁয়াই খুব দ্রুত বমির ভাব, মাথাঘোরা আর মাত্রাতিরিক্ত অবসাদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। অতিরিক্ত শারীরিক তাপে অবিরাম ভুগে চলা এক্সট্রা অভিনেতারা শ্যুটিং ও আত্মাহুতির সমষ্টিগত সংকল্পটি চিত্রিত করার জন্য বাধ্যতামূলক কোরিওগ্রাফি সম্পাদন ইত্যাদি কারণে শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছিলেন। বনশালী এই শ্যুটকে "শারীরিক নয়, বরং মানসিকভাবে অনেক বেশি কঠিন" বলে বর্ণনা করেছেন। নিয়ম না মানা এক্সট্রাদের ছবির শ্যুটিং সম্পূর্ণ করার কাজে বাধা হয়ে ওঠার মত মানসিক ও ব্যয়বহুল সমস্যার সমাধান করার জন্য, চলচ্চিত্র পরিচালকরা, তাঁদের নামপরিচয়হীন জনতার ভূমিকায় অভিনেতা নিযুক্ত করার সময় সম্পূর্ণ অন্য একটি পন্থা নিতেই পারেন।

আরআরআর (এস. এস. রাজামৌলি, ২০২২) ছবিটির প্রথম দৃশ্যটিতে দেখা যায় ১৯২০ সালের ভারতে, একটি প্রবল গরমের দিনে দিল্লির উপকণ্ঠের একটি ঔপনিবেশিক থানায় ক্রুদ্ধ যুবকেরা জমায়েত হয়েছেন কলকাতায় লালা লাজপত রাই-এর গ্রেফতারের প্রতিবাদে। একজন সাম্রাজ্যের পক্ষীয় আধিকারিক (রাম চরণ) কিছুক্ষণের মধ্যেই এই জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেবেন। এই রাম চরণের পেশী আস্ফালন একটি সংশোধনবাদী কল্পনার সূচনা করে। ছবিটি দর্শকদের জানায়, ক্ষমতার হস্তান্তর আদতে যখন হয়েছে, তার অনেক দশক আগেই সশস্ত্র আক্রমণের সাহায্যে ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান হতে পারত। *জনগণ,* যাঁরা সমষ্টিগত অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিমূর্তি ছিলেন, তাঁদের ছবির ভিজ্যুয়াল পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে সরিয়ে, এই ঐতিহাসিক কল্পনা তার ভিজ্যুয়াল প্রকাশ খুঁজে পায় অসীম শক্তিশালী সুপারহিরোদের মধ্যে। বস্তুত, যে জনতাকে আমরা থানা ঘেরাও করতে দেখি, তাঁরা আদতে মরীচিকা। এঁদের মধ্যে অনেকেই বেতনভূক এক্সট্রা নন, বরং ক্রাউড সিমুলেশন সফটওয়্যার দিয়ে তৈরি ডিজিটাল "প্রতিনিধি" মাত্র। একইভাবে, বড় আকারের ভিড় আজকাল ডিজিটাল প্রতিনিধিদের ব্যবহার করে তৈরি, পোষাকাবৃত ও জীবন্তসদৃশ করা হয়। এইভাবেই, একটি তলোয়ার যুদ্ধকে ঘিরে বর্ম পরা সৈন্য (*পন্নিয়িন সেলভান*) বা হেলিকপ্টার নামার সময় তাকে ঘিরে বন্দুক কাঁধে কম্যান্ডোদের (*জওয়ান*) জমায়েত তৈরি হয়। কোভিড-১৯, যার কারণে ভারতের সমস্ত চলচ্চিত্র শিল্পকেন্দ্রে কঠোর নিরাপত্তাবিধি চালু করা হয়েছিল, সেই অতিমারীর সময় বা তার পরে এই ছবিগুলি তৈরি হয়েছিল। জনতার নির্মিত প্রতিচ্ছায়া ব্যবহার করে অতিমারী চলাকালীন শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার নিয়ম মানা সম্ভব হয় (এবং চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের একটি "উত্তর-মানব"

মানসিকতা নিয়ে টিঁকে থাকতে সক্ষম করেছিল)। কিন্তু, অতিমারীর তাণ্ডব শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও এই জাতীয় "সমাধান" স্থায়ী হয়ে যেতে পারে, যে কারণে চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রক্রিয়াতে বিবর্তন খুব দ্রুত ঘটতে পারে। এর ফলাফল ভোগ করবেন চলচ্চিত্রের নির্মাণ ও প্রযোজনার সঙ্গে যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে জড়িত, সেই তাঁরাই।

আরআরআর (এস. এস. রাজামৌলি) ছবির স্থিরচিত্র

তুলনা করার জন্য এরকমই একটি জনসমাবেশ আরেকটি জাতীয়তাবাদী ছবি *গান্ধী* (ডেভিড অ্যাটেনবর, ১৯৮২)-র উদাহরণটি দেখা যাক। এই ছবিতে, জনতার ভূমিকায় অভিনয় করেন এমন ব্যক্তি সরবরাহকারী সংস্থা, অনুবাদক ও মেগাফোন ব্যবহার করে হাজার, হাজার জীবন্ত মানুষ জড় করা হয়েছিল উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনের উদীয়মান রাজনৈতিক জনচেতনার পুনর্নির্মাণের জন্য। ভারতে এই ছবির নির্মাণ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয় বলে সহ-প্রযোজক হিসেবে ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন উত্তেজনা কমানোর জন্য একটি সমঝোতায় আসেঃ ভারতে প্রদর্শনীর পর ছবিটি থেকে যে টাকা আয় হবে, তা পুরোটাই চলচ্চিত্রকর্মীদের সাহায্যের জন্য গঠিত একটি কল্যাণমূলক প্রকল্পে কাজে লাগান হবে। এক্সট্রা বা জুনিয়র আর্টিস্টদের প্রতিনিধিত্ব করে যে সংগঠনগুলি, সেগুলি এই কর্মীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশ ছিল। এই চুক্তিটি তাই সুতীব্র একটি রাজনৈতিক লড়াই-এর ফলাফল। ১৯৮০-

র দশক জুড়ে, চলচ্চিত্র প্রযোজকদের কাছ থেকে উত্তমতর শর্ত আদায় করতে ও সরকারের কাছ থেকে স্বীকৃতি পেতে চলচ্চিত্রকর্মীরা বারংবার কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন। তাঁদের শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা অসম্ভব সূক্ষ্ম কিছু বিষয় নিয়ে ঘটে। পাঁচটির বেশি না তার কম শব্দ আছে সংলাপে, জলে পা ডুবিয়ে হাঁটার সময় তাঁদের হাঁটু জলের উপরে ছিল না নিচে, আর তাঁদের মুখ স্পষ্টভাবে ক্যামেরায় দেখা গেছে না যায় নি – এই জাতীয় বিষয়ের উপর নির্ভর করবে তাঁদের বেতন। নেপথ্য অভিনেতাদের তুলনামূলক নীরবতা ও স্তব্ধতা, এমনকি, তাঁদের পরিচয়হীনতাও আসলে একটি আর্থিক হিসেব, যার ফলাফল ছবির নান্দনিকতাকে প্রাভাবিত করতে পারে। আমার *সিইয়িং থিংস* (ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ২০২৪) বইতে ১৯৮০-র দশকের বম্বের হরর ছবির প্রযোজনা নিয়ে আলোচনার সময় এই রাজনৈতিক লড়াইটির নিয়ে আমি বিষদে আলোচনা করেছি। *গান্ধী* ছবিতে এই লড়াই-এর খানিকটা অংশ ফুটে ওঠে। ছবিটি দেখতে দেখতে, ঠিক মুহূর্তে যদি দর্শক ছবিটি থামিয়ে ফেলতে পারেন, তবে দেখতে পাবেন, এক্সট্রা অভিনেতারা ক্যামেরা থেকে মুখ ঘুরিয়ে, তাঁদের ত্রাণকর্তা নেতার (নামভূমিকায় অর্ধ-শ্বেতাঙ্গ অভিনেতা বেন কিংসলে) দিকে চোখ রাখার বদলে সরাসরি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছেন। এই অবাধ্যতা, যা সিনেমাটিক কল্পকাহিনীতে জীবনযাপনের বাস্তবতার প্রবেশ ঘটায়, আসলে এমন একটি স্ক্রিপ্ট-বহির্ভূত অভ্যুত্থান, যা সম্ভব একমাত্র জীবন্ত কুশলীদের উপস্থিতিতেই। তাঁদের অবসন্ন বা সংক্রামিত হওয়ার, তাঁদের উচ্চতর বেতনের দাবি বা কর্মবিরতির আহ্বান করার ক্ষমতাকে ভিএফএক্স শিল্পীরা নিঃশব্দে মুছে দিতে দিতে এগিয়ে চলেছেন।

গান্ধী ছবির স্থিরচিত্র (রিচার্ড অ্যাটেনবর ১৯৮২)

ভিএফএক্স শিল্পীরা এখন এক্সট্রাদের বদলে স্ক্রীনের উপর এক্সট্রাদের উপস্থিতির ছায়া সরবরাহ করেন। এই শিল্পীদের অনেকেই মাকুটা ভিএফএক্স (হায়দ্রাবাদ), রেড চিলিজ ভিএফএক্স (মুম্বাই), বা ভিএফএক্সওয়ালা (হায়দ্রাবাদ)-র মত ভারতের নানা ভিএফএক্স স্টুডিও-তে কাজ করেন। হায়দ্রাবাদে বিশেষ করে, চিরকাল চলচ্চিত্র-নির্মাণ যে অঞ্চলে হয়ে এসেছে, সেগুলির কাছাকাছি না থেকে, বরং যে শৌখন অঞ্চলে গ্লোবাল কর্পোরেশনের স্থানীয় অফিসগুলি অবস্থিত, সেই সমস্ত অঞ্চলেই এই ভিএফএক্স স্টুডিওগুলির জমায়েত। এই স্টুডিওগুলির পরিসর নির্বাচন থেকেই ভারতে এই ভিএফএক্স শিল্পের উপস্থিতির মূল উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট হয়। হলিউড বহুদিন থেকেই ডিজিটাল ভিজ্যুয়াল এফেক্টের উপর নির্ভরশীল, এবং ভারতে এই ভিএফএক্স স্টুডিওগুলি প্রথম তৈরি হয়েছিল হলিউডের স্টুডিও থেকে আউটসোর্স করা ডিজিটাল শ্রম সরবরাহ করার জন্য। বাস্তবিকই, *গ্ল্যাডিয়েটর* (রিডলি স্কট, ২০০০) এবং *দ্য লর্ড অফ দ্য রিংগস* (পিটার জ্যাকসন, ২০০১)-এর মত ছবিগুলি দেখলেই বোঝা যায় যে, এই শতাব্দীর শুরুতে ক্রাউড সিমুলেশন সফটওয়্যার প্রথম যেখানে বিপ্লব এনেছিল, তা হল হলিউডের চিলচ্চিত্রশিল্প। তারপর থেকেই সারা বিশ্ব জুড়ে ভিএফএফ-এর কাজে ভারতের অবদান ক্রমশ বেড়ে চলেছে। গোটা পৃথিবীতে ভিএফএক্স-এর যত কাজ হয়, তার ২০ শতাংশই ভারতে তৈরি হয়। এই তথ্যটি শুধু ভারতীয় চলচ্চিত্র ঠিক কি বা কাকে বলে, তার ধারণাকেই নয়, সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে কি ধরনের শোষণমূলক শ্রম লাগামছাড়া হয়ে উঠতে পারে, তার ধারণাকেও গুলিয়ে দেয়। ভিএফএক্স-এর কাজ শ্রমের নব্য-উদারনৈতিক পুনর্নির্মাণের একটি উপসর্গ। ভিএফএক্স নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা ইউনিয়নের অংশ নন এবং ভিএফএক্স নামক পিঠের একটি টুকরো পেতে তাঁরা একটি টাইম জোনে বসে আরেকটি টাইম জোনের সময় অনুযায়ী কাজ করে চলেন ও অন্যান্য দেশের শিল্পীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামেন। মারাত্মক চাপের মধ্যে কাজ করতে করতে এই শিল্পীরা খুব দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যান, যার ফলে স্টুডিওগুলি দেউলিয়া হয়ে যায়। এর থেকেই প্রমাণিত যে ভিএফএক্স শিল্পীরা "মানসিক শ্রম বেচে এমন শীততাপনিয়ন্ত্রিত মিষ্টির দোকানের কুলি" থেকে হয়ত আরও একটু বেশি কিছু। সুপারস্টারদের পুরোভূমিতে ও সকলের মনোযোগের কেন্দ্রে রাখার জন্য যে জুনিয়র শিল্পীরা দশকের পর দশক ধরে মানবিক সম্পূরক হিসেবে কাজ করে চলেছেন, তাঁদেরকে গণ-অতিরেক হিসেবে দাগিয়ে দিয়ে, ভিএফএক্স শিল্পীরা ছবিতে ডিজিটাল এক্সট্রা ব্যবহারের পক্ষ নিয়ে ফেলছেন। এর ফলে নিজেদের অজান্তেই তাঁরা নেপথ্যকে বা জুনিয়র শিল্পীদের ইউনিয়নকে

অপ্রয়োজনীয় করে তোলার কাজে সাহায্য করছেন। প্রকৃতপক্ষে, নেপথ্য অভিনেতাদের লড়াই থেকে এই ভিএফএক্স শিল্পীরা অনেক কিছুই শিখতে পারেন।

কার্তিক নায়ার টেম্পল ইউনিভার্সিটির ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া আর্টস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। তিনি *সিয়িং থিংস* (ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ২০২৪) বইটির লেখক।